দৈনিক ইনকিলাব

17 FEB 20-3

কর্মজীবী শিশুদের জন্য শিক্ষা

বই-খাতা নিয়ে যে বয়সে শিশুদের স্কুলে যাওয়ার কথা, যে বয়সে খেলাঘরের রঙীন জগতে বিভোর হয়ে থাকার কথা সে বয়সে যদি শিশুদের সংসারের ঘানি টানতে হয় তবে কোথায় যেন হারিয়ে যায় তার স্কুল, তার স্বপ্নের রঙীন জগৎ। যাদের বয়স ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে, যারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে নিজে বেঁচে থাকছে এবং পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখছে, অভাব আর দরিদ্রতার কাছে যাদের সুকোমল বৃত্তিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শিশুদের অভিহিত করা হয় আগামী দিনের নাগরিক হিসেবে। যদি আগামীর নাগরিক আজকের সমাজের অনাদর আর অবহেলার শিকার হয়, পরিণত হয় বোঝায় তবে কি জাতি শিক্ষিত হবার গৌরব দাবি করতে পারবে? আমাদের দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর বেশীরভাগ মানুষই দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। অনুন্নত দেশের মত আমাদের দেশের দরিদ্র শিশুরাও খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত্। শিশু কল্যাণের এই প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাবে তাদের কচি হাত তুলে নিচ্ছে পরিশ্রমের কঠিন জোয়াল। এসব হতভাগ্য শিশুরা রিকশা চালাচ্ছে, পাথর ভাঙছে, ওয়েল্ডিং কারখানায় কাজ করছে, গাড়ীর হেলপারের কাজ করছে আর হাজার হাজার শিশু কাজ করছে গার্মেন্টস শিল্পে। বাংলাদেশে শিশুশ্রম বেড়েই চলছে, অথচ জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম আইনে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। কিন্তু এই আইন শিশুশ্রম বন্ধ করতে পারেনি। এই সমস্যা শুধু দেশের কাছেই নয় বরং শিশুদের কাছেও এক দুর্বিষহ বোঝাস্বরূপ। শিশুশ্রমে কোন মানবতা বা নিরাপত্তা নেই। সরকার শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ রাখে কিন্তু যাদের জন্য এই আয়োজন সেই বিশাল অংশের অর্ধেকের বেশীই যদি এইরকম মানবেতর জীবন যাপন করে তবে কোথায় এই আয়োজনের স্বার্থকতা। এদের এই অনিশ্চিত জীবন এদের নিয়ে যাচ্ছে ভয়াবহ এক পরিস্থিতির দিকে। এই শিশুশ্রম বন্ধে কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। যেমন- (১) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, (২) বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ, (৩) বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণ, (৪) উপবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি। কিন্তু এখানেও সমস্যা দৃশ্যমান। যেমন- সকল শিশু স্কুলে যায় না, আর স্কুলে গেলেও ঝরে পড়ার হার আশংকাজনকভাবে বেড়ে যায়। বেশীরভাগ স্কুলে দেখা যায় তিন মাসের উপবৃত্তির টাকা একসঙ্গে দেয়া হয় তখন এবং যখন বছরের প্রথম মাসে কার্ড করার মৌসুমে প্রায় শত শিশু ভর্তি হয়। মূলত উপবৃত্তির জন্যই কিছু শিশু আগে আর উপবৃত্তি পাওয়ার পর এরা আবার নিজ নিজ কর্মে ফিরে যায় অর্থাৎ আবার তারা বিভিন্ন কাজে লেগে যায়। আর উপবৃত্তি প্রদানের যে সুব্যবস্থা তাতে উপবৃত্তি না পাওয়া শিশুরা স্কুল ত্যাগে বাধ্য হচ্ছে। একটা বিদ্যালয়ে ১০০ ছাত্র হলে উপবৃত্তি পাবে ৪০ জন ছাত্র। এভাবে পার্সেন্টেজের ওপর এটা নির্ভর করে। তাহলে অবশিষ্ট গরীব ছাত্রগুলো কি দোষ করল? এই অবশিষ্ট ছাত্রগুলোই বিদ্যালয় ছেড়ে যাচ্ছে এবং জীবীকার তাগিদে শিশুশ্রমে নিযুক্ত হচ্ছে।

শিশুশ্রম বন্ধ করে তাদের শিক্ষাদানে যে যে পদক্ষেপ নেয়া জরুরী তা হল- (১) সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে অপ্রাতিষ্ঠনিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ছাড়িয়ে দিতে হবে, (২) শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে যাতে সেই শিক্ষা বাস্তব জীবনের সাথে সংযোগ ঘটিয়ে তাদের দারিদ্র্যকে দূর করতে পারে ও জীবন যাত্রারমান উন্নয়ন করতে পারে, (৩) যেসব দরিদ্র পরিবারের শিশুরা শ্রমে নিযুক্ত হয় সেসব পরিবার চিহ্নিত করে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে, (৪) শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে তাদের উপযোগী শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নিতে হবে, (৫) আইএলও কনভেনশনের আইন যেন সকল শিশুর ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে, (৬) শিশুশ্রমের ক্ষতিকারক দিকগুলো জনসম্মুখে তুলে ধরতে হবে, (৭) যারা শিশুদের দিয়ে শ্রম আদায় করে নিচ্ছে তাদের এহেন মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে, (৮) শিশু অধিকার আইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে, (৯) সরকারীভাবে শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান করতে হবে, (১০) জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করতে হবে।

১৯৯৭ সালের এক রিপোর্টে দেখা যায়, শতকরা ৪৮.৭১ জন কৃষিকাজ, শতকরা, ১৩.২১ জন নির্মাণ কাজ, পরিবহন কাজ, দোকানের কাজ, শতকরা ২৮.৬৩ জন উৎপাদন কাজ, কারখানার মেরামত কাজ এবং শতকরা ৩.১৫ জন অন্যান্য কাজে নিয়োজিত। শিশু শ্রমিকের সংখ্যা '৯৫/৯৬ সালে ১১.৬%। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগ শিশু। ১৯৯০ সালে শিশুদের জন্য বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে সাত প্রকার শিশুকে বিপন্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ঐ সাত প্রকার শিশুর মধ্যে কর্মজীবী শিশুও রয়েছে।

যেসব দেশে শিশুশ্রমের নির্মম বাস্তবতা রয়েছে সেসব দেশ ইতোমধ্যেই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে শিশুশ্রম বন্ধ করা গেলে দেশ একটি শিক্ষিত জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে।

❑ শামীম নাজ শুভ্রা